আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৩ বর্ষ, দৈনিক ৩১১ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৪ আশ্বিন ১৪২৫

সম্পাদকীয় ১।

ভারত হতে চলেছে আরও শক্তিধর

নির্জোট আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ঠান্ডা যুদ্ধে বিশ্ব রাজনীতি যখন টালমাটাল, যখন দুই সুপার পাওয়ারকে ঘিরে বিশ্বব্যাপী ক্ষমতার অক্ষবিন্যাস ক্রমশ দানা বাঁধছে, সেই পরিস্থিতিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু তাঁর অসাধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দৃঢ় মানসিকতার প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন জোট নিরপেক্ষ অবস্থানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে একের পর এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপে। বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ ভারত সেই পর্বে বিশ্ব মানচিত্রে নিজেই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে পরিণত হয়েছিল। জওহরলালের আহ্বানে সাড়া দিয়ে একের পর এক দেশ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের মঞ্চে শামিল হয়েছিল। সেই সময়কার দুই প্রধান শক্তিধর তথা সুপার পাওয়ার সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-কারও সঙ্গে জোট না বাঁধলেও সোভিয়েতের প্রতি ভারতের কোথাও একটা নরম অনুভূতি ছিল। সেই অনুভূতিই ওই দুই দেশকে কাছাকাছি এনেছিল। নেহরু যুগ পেরিয়ে তাঁর কন্যা ইন্দিরা গান্ধীর আমলে ভারত-সোভিয়েত সখ্যের ওই ধারা আরও পরিপুষ্ট হয়েছিল। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীনতাকামী ওই রাষ্ট্রটির জনগণের দিকে ভারত পূর্ণমাত্রায় সক্রিয় সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। প্রধানত ভারতের প্রত্যক্ষ সহায়তার জোরেই পাকিস্তানকে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে শোচনীয় পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। সেইসময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দাঁড়িয়েছিল পাকিস্তানের পক্ষে। পাক বাহিনীকে রসদ জোগাতে মার্কিন রণতরী ভারত মহাসাগরের উদ্দেশে রওনাও দিয়েছিল। যদিও ওই সক্রিয়তা চূড়ান্ত রূপ পায়নি। সেই ঝোড়ো সময়ে সোভিয়েত কিন্তু ভারতের প্রতি সমর্থন জুগিয়েছিল। দুই দেশ ক্রমশ হয়ে উঠেছিল পরস্পরের স্বাভাবিক মিত্র। পরবর্তীকালে অবশ্য বিশ্ব রাজনীতি সর্বদা এক খাতে বইতে পারেনি। নদীর মতো মতিগতি তার। নানা ভাঙাচোরা আর পথ বদলে বহুকালের চেনা বিষয়ও অচেনা হয়ে উঠেছে। নব্বইয়ের দশকের একেবারে গোড়ায় সেভিয়েত ইউনিয়ন খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যাওয়ার জেরে বিশ্ব রাজনীতির দীর্ঘকালের ভারসাম্যটাই এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। সোভিয়েতের বিনাশের জেরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হয়ে উঠেছিল বিশ্বের একমাত্র মাতব্বর। ভারতকে কাছে পেতে মার্কিনিদের আগ্রহও তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছিল। ভারতও তার অবস্থান অনেকটাই বদলে নিয়েছিল। ফলে, ভারত-মার্কিন বন্ধুত্বের নতুন অধ্যায় শুরু হতে খুব বেশি সময় লাগেনি। অন্যদিকে, চীন ধীরে ধীরে নিজের শক্তির বিকাশ ও প্রকাশ ঘটানো শুরু করে। আর তারই পাশাপাশি সোভিয়েতের ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে মাথা তুলতে থাকে রাশিয়া। এশিয়া ও ইউরো-এশিয়ায় দুই শক্তিধরের আর্বিভাবে ফের ক্ষমতার পুনর্বিন্যাসের পরিবেশ সৃষ্টি হতে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে একরকম চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বিশ্বজোড়া আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে নানান পদক্ষেপ নিতে থাকে চীন। সে পাকিস্তানকে নিজের দিকে টেনে নিতে সক্ষম হয়। রাশিয়াও পরোক্ষে ওই একই মঞ্চের সমর্থক হয়ে উঠেছে। ফলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যারপরনাই ক্ষুব্ধ। এদিকে, ভারতও অল্প সময়ের মধ্যে সমৃদ্ধশালী ও শক্তিধর একটি রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। একদিকে আভ্যন্তরীণ নানা ক্ষেত্রে উন্নয়ন, অন্যদিকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ মোকাবিলার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণকে সমান গুরুত্ব দিয়েছে। স্বভাবজাত শান্তিপ্রিয় হলেও আত্মরক্ষার প্রয়োজনে নিজেকে যথোপযুক্তভাবে প্রস্তুত রাখার বাস্তববোধ ভারতের আছে। সেই সুবাদে গত কয়েক দশকে প্রতিরক্ষার বিষয়টি আগের তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্ব লাভ করছে। সে কারণেই পূর্বতন ইউপিএ সরকার ফ্রান্স থেকে রাফাল যুদ্ধবিমান কেনার চুক্তি করেছিল। একই কারণে বর্তমান এনডিএ সরকার রাশিয়া থেকে অত্যাধুনিক এস-৪০০ ক্ষেপণাস্ত্র কেনার চুক্তি করল। এই চুক্তির ফলে ভারতের অস্ত্রভাণ্ডার আরও অনেক বেশি সমৃদ্ধ হবে। ভারত হতে পারবে আরও শক্তিধর। অস্ত্র উঁচিয়ে এই দেশটিকে চোখ রাঙানোর আগে অন্যদের আরও বহুবার ভাবতে হবে। কারণ, শত্রুর মোকাবিলায় আরও সবল হচ্ছে ভারত। তাতে কোনও বৃহৎ শক্তি রক্তচক্ষু দেখালেও ভারতের তেমন কিছু যাবে আসবে না। এরই সঙ্গে শুক্রবারের ভারত-রাশিয়া চুক্তি একটি বাড়তি উপহার দিল। তা হল, দুই পুরনো বন্ধুকে ফের কাছাকাছি এনে দেওয়া।

সম্পাদকীয় ২।

ওয়েবসাইটে শুধুই গালভরা দাবি!

একটি সর্বভারতীয় সংবাদ চ্যানেল দ্রুত রং বদলে ফেলল। মোদি সরকারের সমালোচনা করেন এমন কিছু সাংবাদিককে অপসারণের পরই সেই চ্যানেলে ফলাও করে ঘোষণা হল জনমত সমীক্ষার ফল, মোদিই ফিরছেন। কী আশ্চর্য, দেশের নানা প্রান্তেই উপনির্বাচন হচ্ছে, সেখানে কোথাও কিন্তু বিজেপি বা এনডিএ'কে জিততে দেখা যাচ্ছে না! ওই সমীক্ষাই বলছে, দক্ষিণ ভারতে দাঁত ফোটাতে পারছে না বিজেপি, অথচ নাকি গরিষ্ঠতার অঙ্ক পেরিয়ে যাচ্ছে এনডিএ। হতে পারে, গোয়েবলসীয় প্রচারে কত কিছুই না হতে পারে। ফেসবুকে বা অ্যাপে 'ফেক নিউজ' ছড়িয়ে দাঙ্গা বাধানো যেতে পারে, চাপের খেলায় বিরোধীদের কিনে নেওয়া যেতে পারে, ভাগের খেলায় কম শতাংশ ভোট পেয়ে গরিষ্ঠতার অঙ্কেও পৌঁছে যাওয়া যেতে পারে। এবার বাস্তবের কথা শুনুন। কয়েক মাস আগে সেই চ্যানেলটিই মোদি সরকারের সাফল্য-ব্যর্থতা নিয়ে খবর করছিল। সরকারি ওয়েবসাইটে দেওয়া গালভরা দাবির হিসেব নিয়ে তারা গিয়েছিল মাঠে-ময়দানে। মুদ্রা যোজনায় ১২ কোটি মানুষ ৬ লক্ষ কোটি ঋণ পেয়েছেন বলে সরকারের দাবি, অথচ ক্যামেরার সামনে এক ভুক্তভোগী বলছেন, ৫০ হাজারের বদলে মাত্র ২০ হাজার পেয়েছেন তিনি। ৭৫ শতাংশ টাকা পেয়েছেন পুরনো ব্যবসায়ীরাই। উজ্জ্বলা যোজনায় নাকি ৩৯,৪৭৭,৭২৩টি এলপিজি সিলিন্ডার পেয়েছেন গরিব মানুষ। ব্যস, ওই পর্যন্তই। একটি সিলিন্ডার পেলেও, প্রায় হাজার টাকা দিয়ে পরের সিলিন্ডারটি কেনার ক্ষমতা তাঁদের কারও নেই। বালিয়ার সীমা দেবীর কাহিনী এরকমই। তাঁকে নিজের হাতে গ্যাস সিলিন্ডার দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই চ্যানেলের ওয়েবসাইটেই এই সব রিপোর্ট ছিল, যে চ্যানেল মোদিকে জিতিয়ে দিচ্ছে। আমরা কোনটা ধরব?

বাঙালির নিজস্ব উৎসবে এত শকুনের দৃষ্টি কবে থেকে পড়ল?

বিশেষ প্রতিনিধি

খাতায় কলমে এটা নাকি আশ্বিন। আকাশে পেঁজা তুলোর মত মেঘও ঘোরাঘুরি করছে। কিন্তু গরমের কমতি নেই। রাস্তায় বার হলে গরমে হাঁসফাঁস, সন্ধেতেও কষ্ট বাড়ছে বই কমছে না। সত্যি, এত গরম দুর্গাপুজোর আগে কবার দেখেছে বাঙালি! তবু এই সময়টা এমনি এমনিই মনটা বেশ ভাল লাগে। পাড়ায় পাড়ায় প্যান্ডেল তৈরির বাঁশ বাঁধা হচ্ছে, কুমোরপাড়ায় উঁকিঝুঁকি মারলে দেখা যাচ্ছে, তৈরি হচ্ছে ঠাকুর। কালো গঙ্গামাটির ওপর ফুটে উঠছে দেবীর নয়নাভিরাম মুখ। বাতাসে পুজো পুজো গন্ধ, গড়িয়াহাট, শ্যামবাজার, নিউ মার্কেটে ভিড় ধরছে না। মা আসছেন।

আচ্ছা, অন্যান্য বছরের মত এবারও কি মাকে বেশ্যা আখ্যা দিয়ে নিয়মমাফিক বেরিয়ে গিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায় একের পর এক পোস্ট? মূলনিবাসী দয়ালু রাজা মহিষাসুরের প্রতি দেবতাদের পাঠানো 'বেশ্যা' দুর্গার ছলনা ও শেষমেষ অন্যায়ভাবে হত্যা সেই সব পোস্টের একমাত্র উপজীব্য। আমরা বাঙালি, দেবী দুর্গাকে কন্যা সম্বোধন করি। বছরে একবারই তো মেয়ে আসে বাপের বাড়িতে। কত যুগের কত বালিকা, কিশোরী বধূর শ্বশুর বাড়ি থেকে মায়ের কাছে না ফিরতে পারার যন্ত্রণা আখ্যায়িত হয়েছে আমাদের শাক্ত পদাবলীতে। ছোট মেয়েকে গৌরীদানে বাধ্য হয়েছে বাবা মা, নৌকা করে সে চলে গিয়েছে দূরে, চোখের জলে ভাসছিল তার চন্দনচর্চিত মুখ, ঠোঁট ফুলে উঠেছিল অভিমানে। কতদিন কেটে গিয়েছে, সে আর ফেরেনি। কেমন আছে মেয়েটা? দুবেলা ঠিকমত খেতে পাচ্ছে তো? সকলে ভালবেসেছে তো তাকে?

সে যে মাছ খেতে বড্ড ভালবাসে, শাশুড়ি দেয় তো তার পাতে একটু মাছের টুকরো? অসুখ হলে কে দেখে, দুঃখ পেলে কার কাছে গিয়ে কাঁদে সে ? বাবা মায়ের এত কষ্ট, উদ্বেগ আর যন্ত্রণা দিয়ে গড়ে উঠেছে পদাবলীর জগৎ, সেখানে দেবতা-অসুরদের যুদ্ধ ও ছলনার গল্পের প্রবেশ কোথায়! বিসর্জনের আগে মায়ের সঙ্গে সঙ্গে অসুরের মুখেও তো গুঁজে দেওয়া হয় মিষ্টির টুকরো, সেও যে ঘরেরই ছেলে। মায়ের সঙ্গে আসে প্রতি বছর, অত আপন পর ভেদ করলে চলে!

বাঙালির এই নিজস্ব উৎসব, এই শ্রেষ্ঠ উৎসবে এত শকুনের দৃষ্টি কবে থেকে পড়ল? কবে থেকে শুরু হল আমাদের ঘরের মেয়ের এই তীব্র অপমান, তাকে সমীহ করে, ভিক্ষে করতে হয় না, যত অভাব, না খেতে পাওয়ার কষ্ট সব এই পুজোর দিনগুলোতে। আবার এগুলো তো শেয়ার করি আমরাই, পাঁচজনের দেখার সুবিধে করে দিই, যাতে লোকের মনে প্রশ্ন জাগে, সত্যিই তো, দেশজুড়ে এত কষ্ট, অসহায়তা, সে সব না মিটিয়ে মাছের স্বর্ণযুগ ফিরে আসবে। জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন, কালোবাজারিদের ল্যাম্পপোস্টে ঝোলাবেন। ইংরেজ গিয়েছে, নেহরু জমানাও শেষ। গোলা ভরা ধান যেমন আসেনি, তেমনই ল্যাম্পপোস্টে ঝুলতে দেখা যায়নি একজনও কালোবাজারিকে। একইভাবে পুজো বন্ধ

আমাদেরই চোখের সামনে? প্রতি বছর পুজো এলে ফেসবুক ভরে যায় অসংখ্য তোমার দুর্গা আমার দুর্গা পোস্টে, যার মূল বক্তব্য, দেশে অত অনাহার, এত বঞ্চনা, এত ধর্ষণ, রাস্তার ভিখারি মেয়েটা খেতে পাচ্ছে না, পরতে পাচ্ছে না, তোমরা দুর্গাপুজো করছ কোন লজ্জায়। যেন অন্যান্য দিন মেয়েটা মহা ফুর্তিতে থাকে, তার পেট ভরা খাবার জোটে, ধর্ষকরা খামোখা পুজোর পিছনে খরচ করে লাভ কী? বিশ্বাস করুন, আপনার এই চিন্তাভাবনায় কিচ্ছু পাল্টাবে না। যে মেয়েটা এতদিন আধপেটা খেয়েছে, যাবতীয় পুজো বন্ধ করে দিলেও তার ভরপেট খাবার জুটবে না। স্বাধীনতার আগে দেশনেতারা বলতেন, ওই ব্যাটা ইংরেজই যত নষ্টের গোড়া, ওদের তাড়াও, তাহলেই গোলা ভরা ধান, পুকুর ভরা হওয়ার সঙ্গে দারিদ্র্য কমার কোনও সম্পর্ক নেই, মাঝখান থেকে পুজো বন্ধ হয়ে গেলে বেজায় সমস্যায় পড়বেন এর সঙ্গে যুক্ত থেকে পেট চালানো অসংখ্য ছোট ব্যবসায়ী, নামহীন মানুষ। আর একটা কথা, যে মেয়েটার জন্য আজ সোশ্যাল মিডিয়ায় আপনি অ্যাত্ত নাকে কাঁদছেন, সে কিন্তু এই পুজোর দিনই দুমুঠো খেতে পায়। অতএব ফেসবুকীয় বাতেলাবাজিতে একদম বিশ্বাস নয়, এটা কিন্তু আগামী পুজোর রেজোলিউশন হতে পারে।

বাংলায় শক্তিসাধনার ঐতিহ্য তো দু'দিনের নয়। আমাদের সাংখ্য, তন্ত্র সাধনা, শাক্ত পদাবলী-সবেতেই শক্তিবন্দনা। গীতগোবিন্দ, বৈষ্ণব পদাবলী দেখুন, সেখানেও সেই প্রকৃতি-পুরুষ সাধনার জয়গান। এ বাংলা দেবীপীঠ, এখানকার মাটিতে প্রতি বছর কত জানা অজানা পুজো, আরাধনায় দেবীর চরণচিহ্ন পড়ে। শহরের জাঁকজমকের উৎসবই হোক বা গ্রামের বাড়িতে আল্পনা এঁকে, ধান দুর্বো সহযোগে নেহাতই স্বল্প ব্যসনের পুজো-সর্বত্র হাজির থাকেন দেবী, কোজাগরীর পূর্ণিমা ধোয়া রাতে ভাগ্যবান শোনে তাঁর কণ্ঠস্বর, কে জেগে আছ? এই মাতৃ উপাসক জাতির দ্বারে স্মরণাতীতকাল থেকে মা বছর বছর এসেছেন, আসবেনও এভাবেই। সিন্ধু সভ্যতার প্রেগন্যান্ট গডেস, ঋগ্বেদের রাত্রিসূক্ত, জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী, বঙ্কিম চাটুজ্যের বন্দেমাতরম, স্বামী বিবেকানন্দের কালী দি মাদার-জীবনের পদে পদে মাকে নিয়ে, তাঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেই তো বেঁচে রয়েছি আমরা। তবে এবারের পুজোটা কিন্তু অন্যান্য বছরের থেকে আলাদা। আগের আগের বছরের পুজোগুলোয় তো এবারের মত এত রক্ত আর চোখের জল মিশে ছিল না। একটা ছোট্ট ছেলের ৮ বছরের জন্মদিন, তার যত আবদার, এটা ওটা বায়না, তার বাবা-মায়ের কান্না আর পোড়া মাংসের গন্ধ তো অন্যান্য বছর নাকে আসেনি। পুজোর শেষ বেলার কেনাকাটার ভিড়ে, পুজো শুরুর ব্যস্ততায় আর সন্ধের ভিড়ে ঠাসা মণ্ডপে ঠাকুরের মুখের সঙ্গে হয়তো ছায়া ফেলবে নাগেরবাজারের বিভাস ঘোষের মায়েরও মুখ। পুজোর ঠিক আগে যিনি সন্তানহারা হলেন। এই পুজো তো তাঁরও, কিন্তু সত্যিই তাঁর কী?

মাত্র কটাদিনের তো আনন্দ। শেষ হয়ে যাবে পুজো, বাড়ির পথ ধরবেন দেবী দুর্গা। দশমীর রাতে শুরু হবে ভাসান, নদীর জলে ফুটে উঠবে মায়ের মুখ। এ বছরের মত এটাই শেষ দেখা।

গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং যত্র দেবে মহেশ্বরঃ।
সংবৎসরব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত হুমকি রোধে কার্যকর পদক্ষেপ জরুরি

বিশেষ প্রতিনিধি

পৃথিবী একটা গ্রিনহাউজরে মতো। কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন ও অপরাপর গ্রিনহাউজ গ্যাস সূর্যের আলোতে উত্তপ্ত তাপ বায়ু মন্ডলে আটকিয়ে রাখে। আর এর ফলে পৃথিবীর জীবনের জন্য অনুকূল পরিবেশ বজায় থাকে। যদি গ্রিনহাউজ প্রভাব না থাকতো তাহলে পৃথিবীর তাপমাত্রা থাকতো মাইনাস ১৯ ডিগ্রী সেলসিয়াসে। বায়ুমন্ডলে তাপ বৃদ্ধি পাওয়া এখন মেরু অঞ্চলের বরফ গলতে শুরু করেছে। মেরু অঞ্চলের বরফ অনেক সময় আয়নার মতো কাজ করে থাকে। এর ওপর পতিত আলো ৯০ বায়ু মন্ডলে ফিরে যায়। আর যতোটুকু অবশিষ্ট থাকে তার আবার ৯০ ভাগ শোষন করে জল। জল আবার এই তাপ শোষন করে বরফ গলিয়ে দেয়। অপরদিকে প্রতি বছর মানবসৃষ্ট কার্বন ডাইঅক্সাইডের ৫০ শোষণ করে মহাসাগরের পানি। বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে এই জল গরম হলে তা ক্রমহ্রাসমানভাবে কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষন করে এবং উপরিতল এবং গভীরতল জলের মিশ্রণে বাধা তৈরি করে। ফলে বৈশ্বিক উষ্ণতা আর দ্রৌততর হয়। অপরদিকে কার্বন ডাইঅক্সাইডের চেয়ে মিথেনের গ্রিনহাউজ তীব্রতা ২০ গুণেরও বেশি। সাইবেরিয়া অঞ্চলে ১০ বিলিয়ন টনের বেশি সঞ্চিত জৈববর্জ্য বিপুল পরিমান মিথেন ধারন করে আছে। যা বর্তমান সময়ের মনুষ্যসৃষ্ঠ ৭০ বছরের গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমনের সমান। তাই সাইবেরিয়ার বরফ গলে যায়ার কারণে নির্গত মিথেন ধরে রাখার কোন উপায় নেই। তাই এই মিথেন বায়ুমন্ডলে আবার ফিরে যাচ্ছে। বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমান প্রতি ১০০ পিপিএম (পার্টস পার মিলিয়ন) বৃদ্ধির সাথে সাথে তাপ মাত্রা বৃদ্ধিপায় গড়ে ৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস, যা বরফ যুগের সাথে উষ্ণ যুগের তাপমাত্রার পার্থক্য। এক পরিসংখ্যানে জানা গেছে, ১৭৫০ সালের আগে ছয় লাখ বছরের বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ ১৮০ থেকে ৩০০ পিপিএম ছিল, ২০০৫ সালে তা হয়েছে ৩৭৯পিপিএম মিথেন ছিল ৩২ থেকে ৭৯০ পিপিবি (পার্টস পার বিলিয়ন), ২০০৫ সালে তা হয়েছে ১৭৭৪ পিপিবি নাইট্রাস অক্সাইড ছিল ২৭০ পিপিবি, ২০০৫ সালে তা হয়েছে ৩১৯ পিপিবি। বায়ুমন্ডলে এসব গ্যাস ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। মিথেন ও নাইট্রাসসহ অন্যান্য গ্যাস হিসাব করলে বায়ুমন্ডলে গ্রিনহাউজ গ্যাসের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৩০ পিপিএম কার্বন ডাইঅক্সাইড ইকুইভ্যালেন্ট। ধারাবাহিকভাবে এভাবে গ্যাস বৃদ্ধি থাকলে বায়ু মন্ডলে ২০৫০ সাল নাগাদ গ্যাসের পরিমাণ দাঁড়াবে ৫৫০ থেকে ৭০০ পিপিএম কার্বন ডাইঅক্সাইড ইকুইভ্যালেন্ট এবং ২১০০ সাল নাগাদ গিয়ে দাঁড়াবে ৬৫০ থেকে ১২০০ পিপিএম কার্বন ডাইঅক্সাইড ইকুইভ্যালেন্ট। গ্রিন হাউজ গ্যাসের এ প্রবণতা চলতে থাকলে ২১০০ সালে বিশ্বের তাপমাত্রা ২ থেকে ৪.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস পর্যন্ত বেড়ে যাবে। এমনকি তা বেড়ে ৪ ডিগ্রী থেকে ৬.৪

ডিগ্রীতে পৌছতে পারে। এমনিতেই পৃথিবী এখন উষ্ণতম সময় পার করছে। তার ওপর যদি শিল্পায়নের কবলে পড়ে গ্রিন হাউজ গ্যাসের বৃদ্ধির ধারবাহিকতা চলতে থাকে তাহলে মানুষের জীবন, অর্থনৈতিক কাঠামো ও প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রলয়ংকরী ধ্বংসযজ্ঞে সূচনা ঘটতে পারে। ২১০০ সাল নাগাদ সমুদ্রপৃষ্টের উচ্চতা কমপক্ষে ১৮ থেকে ৩৮ ডিগ্রী সেন্টিমিটার এমনকি তা ২৬ থেকে ৫৯ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। গড় তাপমাত্রা, তাপদাহ ও তীব্র বৃষ্টিপাত বাড়বে ব্যাপকভাবে। তাছাড়া খরা, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, টাইফুন ও হ্যারিকেনসহ মৌসুমী ঘূর্ণীঝড়ের ব্যাপকতা এবং উঁচু জোয়ারের প্রচন্ডতা বাড়বে তীব্রভাবে। আর্কটিক ও আন্টার্কটিকার বরফ দ্রৌত কমে আসবে ও গ্রীষ্ম কালে তা বিলোপ পাবে। তাই গ্রিন হাউজ গ্যাসের নিরাপদ মাত্রা ৩৫০ পিপিএম-এ নামিয়ে আনতে হবে। না হলে পৃথিবীর অপরিমেয় এবং অপূরণীয় ক্ষতিসাধিত হবে।

বৈশ্বিক উষ্ণতাজনিত সংকট এখন আমাদেরও ঘিরে ধরেছে। জলবায়ুর কারণে, দেশের গড় তাপমাত্রা বেড়ে গেছে। বদলে গেছে মৌসুমী বৃষ্টিপাতের ধরন। ২০৫০ সালের মধ্যে ভারতের গড় তাপমাত্রা এক থেকে দেড় ডিগ্রী সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেতে পারে। এতে ৬৪ কোটি ৭০ লাখ মানুষের ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। এ সময়ের মধ্যে জন সংখ্যা ১৫০ কোটি ছাড়িয়ে যাবে। তবে বড় ধরনে শঙ্কার কথা হলো এই যে, জলবায়ুর প্রভাবে কয়েক বছর ধরে আমাদের আবহাওয়ায় বড় ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তার মধ্যে বজ্রঝড় অন্যতম। প্রতি বছরই শত শত মানুষ বজ্রঝড়ে নিক্ষিপ্ত বজ্রপাতে মানুষ মারা যাচ্ছে অবলীলায়। তাছাড়া আকস্মিক পাহাড়ী ঢলে জল বৃদ্ধি পাওয়াও কৃষিতে ব্যাপক ক্ষতিসাধন ঘটছে। কৃষি অঞ্চল ডুবে যাওয়ায় খাদ্যে ঘাটতি মোকাবিলা করতে হচ্ছে সেখানকার কৃষকদের। গত দুই দশকে জলবায়ুর প্রভাবে দুর্যোগের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে চারগুণ। তাপমাত্রা বৃদ্ধির দরুন ঝড়, টর্নেডো, ঘূর্নীঝড় ও জলোচ্ছ্বাস বৃদ্ধি পাবে। সমুদ্রপৃষ্টের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাবে। বর্ষায় ব্যাপক বৃষ্টিপাতের কারণে বন্যা, আকস্মিক বন্যা ও নদী ভাঙনের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। মৌসুমী বৃষ্টিপাতের ধরনে পরিবর্তনের ফলে তীব্র খরা দেখা দেবে। সারা দেশে আবহাওয়ার ধরনে (তাপ, চাপ, বৃষ্টিপাত) ব্যাপক অনিশ্চয়তা দেখা দেবে।

বিজ্ঞানীরা বৈশ্বিক উষ্ণতা এবং জলবায়ুর প্রভাব সম্পর্কে বহুদিন ধরেই সতর্কবাণী করে আসলেও স্বল্পোন্নত এবং ধনী দেশ গুলো তাতে কর্ণপাত করেনি। তাদের বিরতিহীন চাপে অবশেষে ১৯৮৮ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বহুপাক্ষিক কাঠামো ইন্টারগভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ। ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিয়োয় অনুষ্ঠিত ১৯২টি সদস্য দেশ জলবায়ু বিষয়ে একমত পোষন করলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতার কারণে কোন কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া যায়নি। অবশেষে ১৯৯৭ সালের ইউএনএফসিসিসির কিয়োটা প্রটোকল ১৭৫টি দেশ নিয়ে গঠিত হয়, যা ২০০৫ সালে থেকে কার্যকর করা হয়। সবশেষ প্যারিসে ১৯২টি দেশের প্রতিনিধি নিয়ে সম্মেলনে ক্ষতিগ্রস্থ স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে ধনী দেশগুলোর সৃষ্ট জলবায়ুর ক্ষতিপূরণ দেয়ার জন্য ঘোষণা আসে। কিন্তু তাও এখন পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিক্ষত রূপে লাভ করতে পারেনি। ১৯৯২ সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত কার্বন নির্গমনে বিভিন্ন দেশের দায়ভার এবং জাতিসংঘ মানব উন্নয়ন সূচিতে তাদের অবস্থানের ভিত্তিতে ধনী দেশের ব্যয় সক্ষমতার মাত্রা নির্ধারন করে গরীব দেশগুলোতে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন ব্যয়ের শতকরা ৪৪ ভাগ বহন করতে হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে, ১৩ ভাগ বহন করতে হবে জাপানকে, ৭ ভাগ বন করতে হবে জার্মানিকে, ৫ ভাগ বহন করতে হবে যুক্তরাজ্য, ৪৫ ভাগ বহন করতে হবে ইটালি, ফ্রান্স ও কানাডাকে এবং ৩ ভাগ বহন করতে হবে স্পেন, অস্টেলিয়া ও দক্ষিন কোরিয়াকে। কিন্তু প্যারিসের সেই ওয়াদা ধনী রাষ্ট্র এবং অনেক শিল্পোন্নত রাষ্ট্র তা মানেনি।

বৈশ্বিক উষ্ণতার কবল থেকে আমাদের মানব সম্পদ, কৃষি এবং অর্থনৈতিক সকট মোকাবিলা করতে হলে এখনই কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। ২০০৭ সালে সিডর আক্রামন করার সময় সুন্দরবন বুক পেতে দিয়ে উপকুলীয় বাসীকে রক্ষা করেছিল। তার অবদান অস্বীকার করার মতো নয়। তাই উপকলীয় অঞ্চলে বনভমি সৃষ্টির লক্ষ্যে বড় ধরনের প্রকল্প গ্রহন করতে হবে। সামনের ভবিষ্যত যেভাবে জলবায়ু আমাদের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে তার প্রস্তুতি এখন থেকেই শুরু করা গেলে সমস্যা যতোই আসুক, আশা করা যায়, ততোটা আমাদের ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।